রোম প্রবাসের শীত-বসন্ত

সমীর রক্ষিত

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

এক

শৈশবের দিকে যাত্রা

শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমানে আমার রোম যাওয়া স্থির হল। মূল যাত্রা শুরু হবে ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে, রাতে। তবে সেইদিনই দমদম থেকে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে ওঁরা আমাকে ঢাকা নিয়ে যাবে। সকালের দিকে। বিমানে কলকাতা থেকে ঢাকা যেতে সময় লাগে আধ ঘন্টার কিছু বেশি। এটুকু আমার উপরি পাওনা, আসলের ওপরে। একেই কি ফাউ বলে? নিতান্ত এটুকুমাত্র ফাউ কিন্তু তা যে আমার কাছে কীরকম মহার্ঘ মনে হল! অন্য কারুর কাছে তা হাস্যকর ঠেকতে পারে। কিন্তু আমার মনে হওয়ার পেছনে কি যথার্থ কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই?

যে কোনো ভ্রমণই আমার কাছে উত্তেজনা মেশানো আনন্দের। সেই সুদূর শৈশব থেকে। কিন্তু ঢাকা যাবার নামে আমার মনের মধ্যে যে রোমাঞ্চ জাগে, তার তো কোনো বর্ণনা দেওয়া যাবে না। তার কারণ কী এই, আমার জন্ম ওপারে? ঢাকা শহর থেকে মাইল তিরিশেক উত্তরে এক গাঁয়ে। আমার আন্তর্জাতিক পাসপোর্টে তার নামটি সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত আছে—রঘুনাথপুর, বন্ধনীর মধ্যে নাউ ইন বাংলাদেশ, এইভাবে। শৈশবের শেকড়বাকড় যখন সবে সেই নদী-বিল-হিজলগাছে ভরা নরম মাটিতে প্রবিষ্ট হতে শুরু করেছে, যখন দুচোখের অগাধ কৌতূহল আগ্রাসী হয়ে উঠছে দৃশ্য থেকে অদৃশ্যে, তখনই উৎপাটিত হয়ে এপারে চলে আসা। এই অকাল উচ্ছেদে কি চিরবিচ্ছেদ আছে? কিম্বা গূঢ় কোনো ক্ষোভ বা অভিমানের ক্ষতমুখ? যা গোপন কোনো ব্যথার উৎস হয়ে থাকে? আজীবন? আর ব্যথার দিকেই কি পক্ষপাত আমাদের, বেশি টান? তাই কি বিদেশ-হয়ে-যাওয়া সেই অখ্যাত গাঁয়ের দিকে এখনও এমন আকর্ষণ? নাকি, এও শৈশবের সেই চিরকালীন কৌশল, যা মানুষকে যাবজ্জীবন বাল্যস্মৃতিতে কয়েদ করে রাখে?

তাই রোম, আথেন্স বা লন্ডন, পৃথিবীর ঢের ঢের নামি শহরের চেয়ে ঢাকা আমার কাছে অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। মনে পড়ে, ফিল্মের ফ্ল্যাশব্যাকের মতো, এক শীতের শেষরাতে আশ্চর্য ঝকঝকে তারাভরা এক বিপুল আকাশ দেখেছিলাম ঘুমভাঙা চোখে, সেই অবুঝ বাল্যে, প্রথম ঢাকা যাত্রার জন্য গোরুর গাড়িতে শুয়ে, রাজেন্দ্রপুর নামক ধ্বনিময় এক রেলস্টেশনে ট্রেন ধরতে যাবার পথে। তেমন উজ্জ্বল ঝুঁকে পড়া আকাশ তো এজীবনে আর কখনও দেখা হল না। কিন্তু তেমন দেখার প্রত্যাশা কি কখনও শেষ হয় না? তাই ভ্রমণে এমন নিরন্তর আকর্ষণ? বস্তুতপক্ষে এজন্যই রোমের পথে ঢাকা যাওয়ার ছোট্ট ফাউকেও আমার এমন মূল্যবান মনে হয়।

বছর চারেক আগেও একবার আমি গিয়েছি ঢাকা পর্যন্ত, সদ্য পরিচিত বন্ধুরা দেশের বাড়িতে যেতে দেয়নি নানান বাস্তব কারণে। এবারও যাওয়া হবে না জানি। তবু ঢাকা যাওয়া যাবে, সে যাওয়া আমার কাছে আমার সেই শৈশবের দিকে যাওয়া। এমন যাওয়া পৃথিবীর আর কোথাও যাওয়াতে ঘটে না।

এরকম ভাবনায় সম্ভবত কিছুটা ভাবালুতার তুচ্ছতা লেপটে থাকে। থাকুক। তবে তা রোমান্টিক তো বটে। আর সব রোমান্সকে চটকে দেয় বিমানবন্দর। দেখতে বিশাল, দেহ সৌষ্ঠবে আন্তর্জাতিক, বিমানবন্দর মাত্রেই চিত্তাকর্ষক। কলকাতাও। এর সঙ্গে মাটি ছেড়ে আকাশে ওড়ার উদ্বেগ আর উদ্দীপনা যুক্ত হয়ে যায়। আর এরই মধ্যে পাসপোর্ট-ভিসা-চেকিং, বোর্ডিং কার্ডের ফরমে কাঁটার মতো সব কূট প্রশ্ন মিলে এত গূঢ় অনুসন্ধান—তাতে যাত্রার অর্ধেক আনন্দই মাটি। যতই নিজেদের ভাব, কলকাতা বিমানবন্দরও রেয়াত করে না। সময় কেড়ে নেবে প্রচুর। ফলে সাগ্রহে যারা বিদায় জানাতে এসেছেন—আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুসুহৃৎ, স্ত্রী আর বালকপুত্র, তাদের ছেড়ে একসময় বিমানবন্দরের গভীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে হয়। এরপরে বিমানে আরোহণের পূর্বমুহূর্তে শুধু একবার ফিরে দেখা এবং হাত তোলা। হস্ত আন্দোলন বিষয়টা কখনও আমার মনঃপূত নয়। কিন্তু মানুষের ভাষা যেখানে পৌঁছায় না, এরকম সঙ্কেত ছাড়া আর উপায় বা কী? আমার রোমযাত্রা শিক্ষাগত কারণে, আর তার মেয়াদ নিতান্ত দু-পাঁচদিনের নয়। লম্বা ছ'মাসের ধাক্কা। ফলে একূল ওকূলের বিস্তর ভাবনা মনের মধ্যে। আর একেবারেই প্রিয়জনদের দিকে তাকিয়ে নিতান্ত সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে উড়ে যাওয়া যায় না, চোখে পলক পড়ে। বুকের ভার বাড়ে। মাধ্যাকর্ষণের টানগুলি বেড়ে যায়?

কিন্তু একবার মাধ্যাকর্ষণের টান উপেক্ষা করে উঁচুতে উঠে গেলে নীচের সব কিছুই সুন্দর দেখায়। কাছের থেকে যা অসুন্দর, তাও। গাছপালা, বনবসতি, নদীসড়ক মিলেমিশে বিচিত্র বর্ণে আঁকা শিল্পীর হাতের চিত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু খুশি হতে পারি না ওপর থেকে শীর্ণকায়া পদ্মাকে যখন দেখি। সড়কপথে ঢাকা যেতে কূলাকূলহীন এই পদ্মা দেখে তো কিছুদিন আগেও শৈশবের মুগ্ধ বিস্ময়বোধ পুনর্জাগরিত হয়েছিল। আর এই যে এখন দেখছি ওপর থেকে— এ যেন সার্ভে ম্যাপের নদী, সরু সর্পিল গেরুয়া রঙে আঁকা। প্রাণের স্পন্দন নেই এ-স্রোতস্বিনীর। স্থির কিন্তু অঙ্কনে নিখুঁত। পদ্মার জন্য মায়া হয়। মাঝে মধ্যে অনেক চর জেগেছে। কিন্তু এ ছবিও সুন্দর দেখায় দৃশ্যের এক রকমের পারফেকশনের কারণে।

আকাশে কোথাও কাঁটাতার নেই। নেই উঁচনো বায়নেটের সীমান্ত বা নো-ম্যানস ল্যান্ড। এপার ওপার সাবলীল ওড়াউড়ি করা পাখির মতোই ঢাকার আকাশে এসে পড়া যায় অবিলম্বেই। এতই স্বল্পায়ু এই উড়ান যেমন ভরে না। মনে হয়, আরও কিছুটা দীর্ঘতর হলে এই অবাধ ভ্রমণ আরও উপভোগ্য হত।

তবু মাটি স্পর্শ করতেই যাত্রীরা মহাখুশি। সম্ভবত মাটিতে জন্ম-নেওয়া মানুষ শূন্যের উড়ানে নিরাপত্তার অভাব বোধ করে থাকে। বিমান বাংলাদেশের কর্মীদের অভ্যর্থনা-আতিথেয়তায় কোনো ত্রুটি নেই। নাকি থাকলেও তা আমার চোখে পড়ে না? ইতিপূর্বে এদেশে এসে সদ্য পরিচিতদের মধ্যেও যে আন্তরিক আতিথেয়তার পরিচয় পেয়েছি, কথায় কথায় দাওয়াতের যে সমারোহ উপভোগ করেছি, তার তুলনা ইহজগতে আর কোথাও আছে বলে তো মনে হয় না। এই বিমানে বেশিরভাগই বাঙালিযাত্রী। আমরা যারা এপার থেকে আন্তর্জাতিক উড়ানের জন্য এসেছি—তাদের মধ্যে ইলিশ মাছের গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি। যদিও এটা শীতকাল, ডিসেম্বরের সীমান্ত পার হয়ে আজ ১ জানুয়ারি, কাজেই ইংরেজি নববর্ষে বাঙালির ইলিশ চাই। কেননা বাংলাদেশ মানেই ইলিশ। বিমানবন্দর থেকে রুপোর

আভাময় ঝকঝকে রোদের নরম উষ্ণতায় ঢাকা শহরে প্রবেশ করি। আমাদের তোলা হল ঢাকার সুখ্যাত পূর্বানী হোটেলে।

হাতে সময় খুব বেশি নেই। ঘড়ির দিকে চোখ রেখে ঢাকার ছোট্ট একটা কর্মসূচি ছকে ফেলতে হয়। যার নাম লাঞ্চ—সেই মধ্যাহ্নভোজে আবার কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটে। এটা আপেক্ষিকতার ফল। আমরা চাই দ্রুত, তত ঝটিতি সম্ভব নয়। কোনোরকমে ভোজ সেরে ছুটি এক বন্ধুর বাড়ি। কোথাও যাবার আগে বহু কাজ অকাজের সঙ্গে মিশে যায়। সময় ফুরায়। ফলে আগে জানানোর কাজটা সারতে পারিনি। বাড়ি পৌঁছে শুনি লেখক সুহৃৎ এখলাসউদ্দিন চলে গেছে তাঁর দ্বিতীয় কর্মস্থল চাটগাঁয়ে।

এরপর একবার ঢাকার বাংলা আকাডেমিতে যাব কিনা ভাবছি, ওখানে অনেকের সঙ্গে সৌহার্দ্য হয়েছিল। বিশেষ করে আছেন লেখক বশীর আলহেলাল, আবুল হাসানাত প্রমুখেরা। কিন্তু একটা ভয় উঁকি মারে মগজে—ওখানে একবার জমে গেলে, যা নিতান্তই অসম্ভব নয়, ওদিকে বিমানবন্দরে পাখি ফুড়ুৎ হতে পারে। এপাখি তো যে সে পাখি নয়, বিশ্বজুড়ে এর ডানার ঝাপটা লাগে।

এদিকে পুরানা পল্টনে মেসোমশাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা না করে গেলে আস্ত রাখবেন না। স্নেহের এতটাই জোর যে স্নেহভাজনকে তা খণ্ড খণ্ড করে ফেলার ক্ষমতা রাখে। এছাড়া এমন উদ্যোগী, কর্মপ্রাণ মানুষকে ভালো লাগে আমার মত আলসেমি উপভোগ করা মানুষের। এর আগের বারে ইনি, মধ্যবয়সি যুবক কমল বসু, আমাকে মোটরবাইকের পেছনে বসিয়ে ঢাকা থেকে শীতলক্ষা পার হয়ে নরসিন্দির দিকে মাইল কুড়ি দূরে হন্দ এক হাটে, নাম বোলতাবাজার, নিয়ে গিয়েছিলেন, যেখানকার জিওল ও কই-মাগুর নাকি বিখ্যাত। মাছের দিকে আমার নেকনজর আছে বইকি!

অতএব আর একমুহূর্তও দেরি নয়, চলো পুরানা পল্টন। এবং আমার স্বভাবদোষে চিরকাল যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়। নিজের সম্পর্কে সম্ভবত আমার দৃঢ় ধারণা আমি এক জন্ম-পরিব্রাজক। ফলে কোনো গৃহীর ঠিকানা লিখে বা মুখস্থ করে রাখাটা আমার পক্ষে নীতিগর্হিত কাজ। প্রয়োজনে খুঁজে নিতে পারি, এবং কারুকেই, কোনো পথচারী বা দোকানীকে, জিজ্ঞাসা না করেই। জিজ্ঞাসায় সহজে জেনে নেওয়ার চেয়ে নিজে খুঁজে বার করার আনন্দের যে তুলনাই হয় না, বহু বার একই পথে ঘুরে নাকানি-চোবানি খেলেও, একথা আমি আমার ঘনিষ্ঠতম মানুষকেও বোঝাতে পারি না। এরা ক্ষুব্ধ হয়ে আমাকে মুখচোরা এই অপবাদ দিয়ে থাকেন। এমন কী স্বয়ং আমার স্ত্রী পর্যন্ত। আমার সঙ্গিনী হিসেবে এমন অভিজ্ঞতা তাকেও সহ্য করতে হয়েছে বহুবার।

তবে আমি যে নিগূঢ় এক পদ্ধতি অনুসরণ করি তাতে পথ ভুল হবার কথাই নয়। যেখানেই আমি আগে গেছি, গোটা তল্লাটের একটা নিখুঁত ছবি আমার মগজের রোলিফ্লেক্স ক্যামেরায় তুলে রাখি। ফলে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই সেই অঞ্চল। যেমন পুরানা পল্টনের সেই ল্যান্ডমার্ক, অত্যন্ত আধুনিকস্থাপত্য ধারায় তৈরি মস্ত বিখ্যাত মসজিদ বায়াতুল মুকাররম। এর কিছুটা দূরেই চমকপ্রদ 'ম্যানডারিন' নামধারী সুসজ্জিত এক চিনে রেস্তোরাঁ। ঠিক তার পাশ দিয়েই মাঝারি মাপের যে গলিটা ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে সেই পথে কয়েকটা বাড়ি পরেই বাঁদিকে একটা পাকা পাঁচিল, যার মাঝখানে কাঠের সদর দরজা। সবুজ রং।

ভেতরে টিনের চালের বাড়ি, বাঁ হাতে এক জননীরূপী কাঁঠালগাছ দাঁড়িয়ে আছে। মাসি-মেসোর বাড়ি। আমি যাব, দেখব, কড়া নাড়ব, ঢুকে পড়ব। এই প্রবল আত্মবিশ্বাসে আমি গলিতে ঢুকি ম্যানডারিন বাঁদিকে রেখে, অগ্রসর হই। হঠাৎ একটা হিসেব-বহির্ভূত পথ সমকোণে এসে উপস্থিত হয় অপ্রত্যাশিতভাবে। তবু আমি এগিয়ে যাই এবং ঘুরে ঘুরে পাক খেতে থাকি। কোথায় সেই পনস-বৃক্ষ? সবুজ দরজা? এরকম পরিস্থিতিতে কারুর কাছে জানতে চাওয়া তো নিজের কাছে হেরে যাওয়া। অথচ সন্ধ্যা নামছে মন্দ মন্থরে। আলো মরছে। আমার মুখ সম্ভবত বেগুনবেচা মুখ হতে শুরু করেছে।

সহসা এক মধ্যবয়সি—'আপনে কার বাড়ি খুঁজেন?' এই মধুর প্রশ্নে আমাকে চিরকৃতজ্ঞ করে নেন। একটা দরজায় তিনি পৌঁছে দেন যার রং ধূসর। এবং কাঁঠালগাছে তখন কাকেরা ফিরেছে। এই গলি কোথায় ছিল এতক্ষণ? মাসি-মেসো চমৎকৃত। সব শুনে আমার অন্তত দেখা করার কর্তব্য বোধে তাঁদের অপত্য স্নেহে ঢেউ উঠে। এবং বিদেশে দীর্ঘ ছ'মাস আমি মিষ্টি জলের মাছ বিনা কী দুঃসহ জীবনযাপন করব, এই ভাবনায় তাঁদের মুখ শুকায়। এবং এই ভর সন্ধেতেই, ভাত না হয় নাই খেলাম, কিন্তু মাছ না খেয়ে কী করে বেরিয়ে যাও তুমি, ঢাকাইয়া বাঙাল ছেলে?

সত্যিই তো। মানতেই হয় এটা অসম্ভব। আর এও জানি, আমি পড়েছি মোগলের হাতে। কেউ কেউ কলকাতাকেই বলেছেন মস্ত গ্রাম। যাকে বলে আর্বানিটি, সেই শুষ্ক নাগরিকতা এখনও কলকাতাবাসীর সব রস নিংড়ে নিতে পারেনি। তাছাড়া কলকাতায় থেকেও আমি তো এখনও ততটাও শহুরে হয়ে উঠতে পারিনি। আমার দ্বিতীয় বাল্যকাল কেটেছে জলপাইগুড়িতে, স্বভাবে এখনও আমি ঘোর মফস্বলি। আর ঢাকায় এসে কারুকে তিন রাত্তিরও কাটাতে হয় না, তার আগেই জানা হয়ে যায় যে ঢাকা কলকাতার চেয়েও স্বভাবে বেশি গ্রামীণ। নির্ভেজাল শহুরে চেতনায় আক্রান্ত নয়। হোক সে বাংলাদেশের রাজধানী, এমন কী অবিভক্ত বাংলারও দ্বিতীয় শহর ছিল যে ঢাকা একদা, সে এখনও আর্বানিটির ধার ধারে না। এখানকার মানুষের স্নেহ, ভালোবাসা, বন্ধুতা, বাৎসল্য, যাবতীয় আবেগ, সবই গাঢ়, উঁচু তারে বাঁধা। তাই আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ দাওয়াতের এমন সমারোহ। এশুধু বহু পদযুক্ত খাওয়া আর খাওয়ানোর আনন্দ নয়, এর মধ্যে প্রকাশ পায় অন্যমাত্রার আত্মীয়তা। এক ধরনের প্রাণের প্রাচুর্যও। আমি একে সরু চোখে দেখি না, সম্ভ্রমের চোখে দেখি। তাই বসে যাই খাবার টেবিলে।

একটি দৃশ্য : ঢাকা শহর

আশার অতীত অকালের ইলিশ আর গোলসা। সেই সঙ্গে সময়োচিত কই। সাধ্যের অতীত আহারে আর অভ্যস্ত নই। কিন্তু আজ তো অভ্যাসের দ্বারা আর নিয়ন্ত্রিত নই আমি। অভ্যাস পড়ে রয়েছে কলকাতায় কিম্বা অতীতে। এখন আমি শৈশবের পথিকও তো বটে, যেহেতু আমি ঢাকায়। এখন আমি ক্ষণকালের উল্টোরথে।

এদিকে ঘড়ির কাঁটা এসব আবেগী হিসেব বোঝে না, তার আপেক্ষিক চঞ্চলতা বেড়ে যায়। আমাকে অতি সত্বর ফিরতে হবে পূর্বানীতে। না, এবারে আর বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নিই না, ফেরার পথের হালহদিস জেনে নিই নিখুঁত। আপাতত জন্ম-পরিব্রাজকের অনুশাসনের কপালে বুলেট ছুঁড়ি।

হোটেলে ফিরে দেখি সাহেবি সময় মেনে ডিনার শুরু হয়ে গেছে। ভেতর থেকে আমার এক দাদা—অনিমেষ চক্রবর্তী হাতছানি দিয়ে ডাকেন—চলে এসো সমীর। শিবপুর বি ই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, আমার চেয়ে বছর চারেকের সিনিয়ার। কলেজের রীতি মানলে তাঁকে দাদাই ডাকতে হয়। ঢাকা বিমানবন্দর থেকে পূর্বানীতে আসার পথে আলাপ। বর্তমানে অনিমেষদা নিউইয়র্ক প্রবাসী। সঙ্গে স্ত্রী ও এক পুত্র। ওঁর একপাশে একটা চেয়ারও ফাঁকা।

অথচ এখন আমি নিজের ভারে মন্থর। সহজে হাতও ওঠে না, কণ্ঠস্বরও নয়। তবু ইশারাতেই জানাই ওপর থেকে ঘুরে আসছি, আপনারা চালিয়ে যান। এখন ওঠানামা করা আমার দরকার। এই মুহূর্তে বিরিয়ানির সুগন্ধে মনে পড়ছে বরিশালের বিখ্যাত বালাম চালের নাম। এই গন্ধের উৎসে কি সেই চাল? এর স্বাদ থেকে কি নিজেকে বঞ্চিত করা উচিত? পুরানা পল্টন থেকে ফিরেছি ঢাকার বিখ্যাত রিকশায়। এতে বসেও কিছুটা ওজন কমেছে। ঢাকা শহরের ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের রসিকতা প্রায় কিংবদন্তির মতো। সেইসব ঢাকাইয়া কুট্টিদের বহু রসবোধের গল্প শুনেছি। কিন্তু এখন আর তাদের দেখা ঢাকায় তেমন মেলে না। তার বদলে জনগণের বাহন হয়ে উঠেছে রিকশা। এমন কী, ঢাকাই বোধহয় একমাত্র রাজধানী-শহর—যেখানে রাজপথে রিকশা চলার জন্য আলাদা লেন আছে, কী সুন্দর ব্যবস্থা, ফুটপাতের পাশেই। সুপরিকল্পিতভাবে। পৃথিবীর অন্য কোনো শহরে এমন পথ আছে কিনা জানি না। আর সে রিকশাও নিতান্তই তিনচাকার সাদামাটা দরকারি যানমাত্র নয়, তার সর্বাঙ্গ জুড়ে একেক রকমের শিল্পকর্ম। ঢাকনার সুচারু আব্রু রচনায় কিম্বা রঙের ব্যবহারে। যেমন ঘটে থাকে সাইকেলের বেলায়, তেমনি রিকশার ক্ষেত্রেও, চালকের সঙ্গে বাহনের এক ধরনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। রিকশা যেন নিতান্ত নিষ্প্রাণ যন্ত্র মাত্র নয়, ঘোড়ার মতো না হলেও, তারও যেন কিছুটা সজীবতা আছে। অন্তত চালকের কাছে। তবে ঘোড়ার গাড়ির সেই প্রাচীন সব গাড়োয়ানদের রসবোধ হালের রিকশা চালকদের মধ্যেও প্রবহমান কিনা, তা পরখ করার সুযোগ এখনও মেলেনি আমার। কিন্তু অতি দ্রুত পথ অতিক্রমণের চেষ্টার মধ্যে রিকশাচালকদের শারীরিক শক্তি প্রকাশের সবল উচ্ছ্বাস আমাকে আকর্ষণ করে। হয়তো এর মধ্যে সময় সংক্ষেপ করে কিছুটা আরও বেশি উপার্জনের তাগিদও থাকে। কিন্তু তবু শ্রমের বিষয়টা যে নিতান্তই নিরানন্দের বোঝা নয়, তার মধ্যে যে আমোদ ও তৃপ্তিও যুক্ত থাকে, তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। আর এই যে তৃপ্তির আনন্দ, তা আমার মতো ভরপেট খাওয়া যাত্রীর খাদ্য পরিপাকেও কিছুটা সাহায্য করে। আনন্দের অংশীদার তো হইই।